লোক প্রশাসন সাময়িকী
৯ম সংখ্যা, জুন ৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

যুগপরিক্রমায় জেলা পরিষদ ঃ বর্তমান কাঠামো ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের *

ভূমিকা

গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে এই উপ-মহাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকশিত করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চলে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে উপর্যুক্ত নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের শাসন কাঠামোয় ক্ষমতাসীন সরকারগুলি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধন এবং ক্ষমতায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার গঠনের জন্য দু'বার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল এবং থানা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ নামে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। সেই সাথে ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলা পরিষদকে শক্তিশালীকরণের জন্য বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে "গ্রাম সরকার" এবং "পল্লী পরিষদ" নামক প্রতিষ্ঠান দুটি গঠন করার জন্য পর্যায়ক্রমে জিয়া সরকার এবং এরশাদ সরকার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এজন্য আইনগত ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ প্রতিষ্ঠান দু'টি সূচনা পর্বেই হোঁচট খেয়ে পড়ায় আলোর মুখ দেখতে পায়নি।

এদেশে সুসংগঠিতভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানাদির বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টার প্রতিফলন আমাদের সংবিধানে ঘটেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে-"রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠান সমূহে কৃষক, শ্রমিক, এবং মহিলাদিগকে যথা সম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।" (অনুচ্ছেদ-৯) তাছাড়া সংবিধানের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে পরিচলিত হবে, এসব প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ার, কর্ম-পরিধি এবং আর্থিক ক্ষমতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সংবিধানের ৫৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ

" (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে ঃ-

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;

(খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা;

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।"

আর স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বর্ণনা করতে গিয়ে ৬০নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

"এই সংবিধানের ৫৯অনুচ্ছেদের বিধানাবলীতে পূর্ণ কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।"

বর্তমানে যে কয়টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কার্যকারিতার সাথে টিকে আছে বা কাজ করছে তার মধ্যে জেলা পরিষদ অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠান। খুব সামান্য মাত্রায় নামের পরিবর্তন ছাড়া আজকের জেলা পরিষদ নামক প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে স্বকীয় ধারায় বিকশিত হয়েছে।

স্থানীয় সরকার পদ্ধতির ক্রমবিকাশ

বৃটিশদের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পদ্ধতি কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে খুব একটা নির্ভরযোগ্য দলিল পাওয়া যায় না। তবে এটা ধারণা করা হয় যে, তখন অধিকাংশ গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল যা কিনা গোত্র বা বর্ণভিত্তিক ছিল। পর্যায়ক্রমে গ্রামভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে বলে ইতিহাস বিশ্লেষকরা বলেন। তবে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পঞ্চায়েত গঠিত হতো। গ্রামের ভূস্বামী বা কৃষকের সাথে ভৃত্যের গোলমাল মিটানোর জন্য পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ার নজির পাওয়া যায়। জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে সামাজিক প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েত প্রথার উদ্ভব ঘটে। এই পঞ্চায়েতের কোন আইনগত ভিত্তি বা বৈধতার ভিত্তি ছিলনা।

মুঘলদের আগমনের পরে নতুন ধরনের ও সুসংবদ্ধ পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। মুঘলরা মুলত সুবা ও সরকার পদ্ধতির প্রশাসনিক কাঠামোর বিকাশ ঘটায়। সুবার পরিচালককে সুবাদার এবং সরকারের পরিচালককে শিকদার বলা হতো। আর তার প্রশাসনিক ইউনিটকে পরগণা হিসেবে চিহ্নিত করে সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই পরগণাসমূহের সুসংবদ্ধভাবে শাসনকার্য পরিচালনার লক্ষ্যে ফৌজদার, কাজী ও মীরডাল নিয়োগ করা হয়। গ্রামে গ্রামে গ্রাম-প্রধান ও চৌকিদার নিয়োগ করা হয়। মুঘল শাসনামলে গ্রামীণ প্রশাসনের পাশাপাশি কোতোয়াল নিয়োগ করার মাধ্যমে মিউনিসিপ্যাল কার্যাদি এবং প্রশাসনিক কার্যাদি যৌথভাবে সম্পন্ন করা

হতো। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন মীর মহল্লাহ থাকতেন। এদিকে একজন কাজী বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত হতেন। বিনামূল্যে খাদ্য ও আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রতিটি শহরে খানকাহ এর ব্যবস্থা ছিল।

বৃটিশদের এদেশে আগমনের পরে গ্রাম এলাকায় জমিদারী প্রথা এবং শহর এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটি প্রথা সৃষ্টি করা হয়। জমিদারগণের বিলাস বহুল জীবনযাপনের প্রতি আসক্তির কারণে পর্যায়ক্রমে তারা জনহিতকর কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। অপরদিকে জনসাধারণের উপরে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধির প্রতিবাদ স্বরূপ ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে (বৃটিশ ঐতিহাসিকগণ একে সিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন) এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এমতাবস্থায় বৃটিশ সরকার পল্লী অঞ্চলে প্রশাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৭০ সালে চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন পাশ করে।

চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন-১৮৭০ ঃ

এই আইনের বলে পল্লী অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে চৌকিদারী পঞ্চায়েত গঠন করা হয়। এর সদস্য সংখ্যা পাঁচজন ছিল। সরকার পঞ্চায়েতের সকল সদস্যকে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করতেন। পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ছিল শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চৌকিদার নিয়োগ করা এবং চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় করে তা দিয়ে তাদের বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করা।

তবে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সদস্যগণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর এজেন্ট হিসেবে কাজ করায় তারা স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না বা কোন উন্নয়নমূলক বা জনকল্যাণমূলক কাজ করতে পারতেন না তাদের এখতিয়ারের সীমাবদ্ধতার কারণে। এসব কারণে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিবর্তে স্থানীয় পর্যায়ে অধিক দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়।

এই আইন দ্বারা ইউনিয়ন কমিটি, লোকাল বোর্ড এবং জেলা বোর্ড গঠন করার দ্বারা পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন, মহকুমা ও জেলাপর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠন ও বিকাশ করার পথ সুপ্রশস্ত করা হয়। অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে প্রবর্তিত এই আইন দ্বারা এ উপমহাদেশে জেলা বোর্ড প্রথমবারের মতো আত্মপ্রকাশ করে। এর পরে কালের বিবর্তন ধারায় জেলা বোর্ড আজকের জেলা পরিষদ রূপে অভিহিত হচ্ছে।

জেলা পরিষদের উদ্ভব

জেলা পরিষদের সৃষ্টি থেকে শুরু করে অদ্যাবধি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত যতগুলি আইন প্রণীত হয়েছে তার পর্যায়ক্রমিক বর্ণনার মাধ্যমে জেলা পরিষদের বিকাশ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

১৮৭১ সালে বাংলা (বেঙ্গল) প্রাদেশিক আইন পরিষদ কর্তৃক সড়ক সেস আইন (Road Cess Act) ১৮৭১ গৃহীত হয়। এই আইনের দ্বারা প্রতিটি জেলায় 'জেলা সড়ক কমিটি' নামক একটি করে কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য এ

কমিটির সকল সদস্যই সরকার কর্তৃক মনোনীত বা নিযুক্ত হতেন। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ছিলেন বেসরকারী এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ সদস্য ছিলেন সরকারী কর্মচারী। আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। যাতায়াতের জন্য সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ছিল জেলা পরিষদের মূল কাজ। এ কমিটিই সেসের হার নিরূপণ করতো। আবার্র সেস আদায়ের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া এ কমিটি নির্ধারণ করে দিতো। এভাবে জেলা প্রশাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের জনসাধারণ অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। জেলা পরিষদ ব্যবস্থার প্রাথমিক কাঠামো বা ভিত এভাবে এই আইনের দ্বারা গ্রথিত হয়েছিল।

বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন-১৮৮৫ ঃ

স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলির উপরে লর্ড রিপোন কর্তৃক ১৮৮২ সালে উপস্থাপিত রেজুলেশনের উপর ভিত্তি করে মুলত রেজুলেশনটির সংশেধিত রূপে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন হিসেবে পাশ হয়। এই আইনে আনুপাতিক হারে অধিক জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের সুযোগ রেখে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার পদ্ধতি চালু করার বিধান প্রবর্তিত হয়। এগুলি ছিল ঃ

(ক) ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি (তবে পাশাপাশি চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটিও চালু রাখা হয়)

(খ) মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড

(গ) জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড

এই আইনে কমপক্ষে ৯জন নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য নিয়ে জেলা বোর্ড গঠনের বিধান রাখা হয়। তবে আয়তন অনুযায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে ৩৪জন পর্যন্তও সদস্য থাকার বিধান ছিল। লোকাল বোর্ডের মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নিজেদের মধ্য থেকে নতুবা বাইরে থেকে নির্বাচিত হতেন। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। জেলা বোর্ডের সদস্যগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতেন অথবা জেলা বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে একজন সদস্য প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে নির্বাচিত হতেন। তবে প্রাদেশিক সরকার সরাসরিভাবে চেয়ারম্যান নিয়োগ দিতো না। ১৯৩৬ সালে লোকাল বোর্ড বিলুপ্ত হওয়ার পরে জেলা বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ভোটারদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সদস্য পদের মেয়াদ ছিল তিন বছর। সদস্য পদের কর্মকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১৯৩২ সালে চার বছর করা হয়। এবং ১৯৩৬ সালে জেলা পরিষদের সদস্য পদের মেয়াদ ৫ বছর করা হয়েছিল। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই প্রাদেশিক সরকার অসদাচরণের কারণে মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত প্রস্তাবক্রমে কোন নির্ধারিত সদস্যকে অপসারণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করতেন। উপরন্তু বিভাগীয় কমিশনার কতিপয় নির্দিষ্ট কারণে যে কোন সদস্যকে অপসারণ করতে পারতেন। প্রতিটি জেলা বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান থাকতেন। তিনিই সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ ও

বাস্তবায়ন করতেন। বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন তথা কার্যকর করণের দায়িত্ব তার উপরে ন্যস্ত ছিলো। ১৯২০ সাল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে পদাধিকারী থাকেন। ১৯২০ সালে জেলা বোর্ডের সদস্যগণ কর্তৃক নিজেদের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য এ নির্বাচন প্রাদেশিক সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। নির্বাচিত চেয়ারম্যানের কাজে শৈথিল্য, দূর্নীতি কিংবা তার অসামর্থের কারণে প্রাদেশিক সরকার তাকে অপসারণ করে নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতে পারতেন। চেয়ারম্যানকে সাহায্য করার জন্য একজন ভাইস-চেয়ারম্যান থাকতেন। চেয়ারম্যান বোর্ডের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। জেলা বোর্ডের মূল কার্যাবলী ছিল প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী এলাকায় সড়ক, ভবন ও পুল নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য এবং পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন বিষয়ক দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি। পথিকদের সুবিধার জন্য ডাক-বাংলো ও সরাইখানা স্থাপন, মাঝে মাঝে জেলার অভ্যন্তরে কৃষিজাত পণ্যসামগ্রী ও গবাদী-পশুর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা জেলা পরিষদ করতো। তাছাড়া দুঃস্থদের সাহায্য ও দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের মতো জনসেবামূলক কার্যাদি জেলা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদন করার বিধান রাখা হয়। এই আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদের আয়ের উৎস ছিল মূলত তিনটি। অর্থাৎ (ক) সেস, (খ) ফি এবং (গ) বিধান লঙ ঘনের জন্য জরিমানা এবং সরকারী অনুদান।

এই আইন অনুযায়ী বেশকিছু সমস্যা বিদ্যমান ছিল। এগুলি হলো ঃ-

(১) জেলা বোর্ডের আয়ের উৎস অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় জেলা বোর্ড পর্যাপ্ত পরিমানে জনকল্যাণমূলক তথা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারতো না।

(২) জেলা বোর্ডের উপরে নির্ভরশীল অধঃস্তন স্থানীয় সরকার পরিষদগুলিকে জেলা বোর্ড তেমন আর্থিক সাহায্য দিতে পারতো না।

(৩) জেলা বোর্ডের হাতে অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি তুলনায় বেশী মাত্রায় ক্ষমতা দেয়ায় তা অনেকটা সেচ্ছাচারী বা স্বৈরাচারী হয়ে উঠার আশঙ্কা ছিল।

(৪) জেলা বোর্ডগুলির উপরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত ব্যাপক মাত্রায় ছিল। ১৯২০ সাল পর্যন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকার বলে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন কালে বিস্তর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করতেন। আর জেলা বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর সুপারিশের দ্বারা মনোনীত হতেন। উপরন্ত সরকার বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করতেন।

বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইন-১৯১৯

এই আইন অনুযায়ী চৌকিদারী পঞ্চায়েত এবং ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ড এবং জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড গঠনের বিধান করা হয়। তবে ১৮৮৫ সালে গঠিত লোকাল বোর্ড ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখা হয়, যা ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত কার্যকরী থাকে।

এই আইন দ্বারা জেলা বোর্ডের গঠনগত ক্ষেত্রে কিছুটা গণতান্ত্রিক চরিত্র আনয়নের বিধান করা হয়েছিল। এই আইনের বিধান মোতাবেক জেলা বোর্ডের মোট সদস্যের

মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হতেন, আর এক তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। এই আইন অনুযায়ী জেলা বোর্ডের সদস্যরা সরাসরিভাবে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান এবং এক বা দুইজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন। যেসব পুরুষের বয়স ২১ বছরের বেশী এবং যাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল তারাই কেবল জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার প্রাপ্ত ছিলেন। জেলা বোর্ডের সদস্য মনোনয়ন প্রথা ১৯৫৬ সালে বাতিল করা হয়। জেলা বোর্ড মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ, জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রীকরণ, পল্লী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ডাকবাংলা সংরক্ষণ এর কাজ করতো। এছাড়া স্বতন্ত্র দফতর হিসেবে শিক্ষা পরিদপ্তর সম্প্রসারিত না হওয়া পর্যন্ত জেলা বোর্ড শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতো। অন্যান্য আয়ের উৎসের সাথে ফেরী ব্যবহারের জন্য ফি আদায়ের ক্ষমতা এবং মোটরযান ট্যাক্সের অংশ সরকার থেকে দেয়ার বিধান রাখা হয়।

এই আইনের দ্বারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষত জেলা পরিষদের বেশকিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও এ পদ্ধতি ছিল মূলত পুরাতন পদ্ধতিরই একটি সংশোধিত রূপ। এতে নতুন কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসেনি। এ আইনে যে ভোটাধিকার দেয়া হয়েছিল তা ছিল সংরক্ষিত ভোটাধিকার। আবার প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতিটা গণতান্ত্রিক ছিলনা।

পাকিস্তান আমল ঃ

পাকিস্তান আমলের প্রথম দশ বছর বৃটিশদের প্রবর্তিত আইন-কানুন দ্বারাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হয়েছে। তবে তাদের সংগঠন ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার গভর্ণর এ, কে, ফজলুল হক এক অধ্যাদেশ জারী করেন। ফলে ১৮৮৫ সালে প্রবর্তিত জেলা বোর্ড সমূহে মনোনয়ন প্রথা রহিত করে সকল সদস্যকে ভোটারদের দ্বারা নির্বাচনের বিধান করা হয়। ১৯৫৭ সালের মে মাসে গৃহীত আইন দ্বারা ১৮৮৫ সালের আইনকে আরও সংশোধন করে জেলা বোর্ডের প্রাপ্ত বয়স্কদের (২১ বছর) ভোটাধিকারের নীতি প্রবর্তিত হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ-১৯৫৯

পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের এক দশক পরে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারী করে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য ভিত্তি রচনা করেছেন বলে ব্যাপকভাবে প্রচার চালান। তাঁর প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি হলো ঃ

১। ইউনিয়ন কাউন্সিল

২। থানা কাউন্সিল

৩। জেলা কাউন্সিল

৪। বিভাগীয় কাউন্সিল।

এ আদেশ বলে জেলা কাউন্সিল মূলত সরকারী কর্মকর্তা ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হতো। জেলা কাউন্সিলের ৫০% সদস্য ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। অবশিষ্ট ৫০% সদস্য জেলা পর্যায়ে নির্দিষ্ট কতগুলি সরকারী পদে কর্মরত সরকারী কর্ম কর্তাগণের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করতেন। তিনি জেলা কাউন্সিলের নির্বাহী প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। তবে ১৯৬৩ সালে নির্বাচিত (অর্থাৎ বেসরকারী) প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান করা হয়। জেলা কাউন্সিলের বিদ্যমান সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত অনাস্থা প্রস্তাবের দ্বারা ভাইস-চেয়ারম্যান অপসারণ করা যেত। জেলা কাউন্সিলের একজন সেক্রেটারী থাকতেন। সাধারণত সিভিল সার্ভিসের লোকদেরকে এ পদে নিয়োগ করা হতো। আর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ এই নিয়োগ দিতেন।

সড়ক, ভবনাদি, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী, নলকূপ, ডাকবাংলা সংরক্ষণ এবং জেলার অন্তর্গত স্থানীয় পরিষদ-সমূহের কর্ম তৎপরতায় সমন্বয় সাধন করা ছিল জেলা কাউন্সিলের অন্যতম কাজ। কর, রেট, টোল, ফি ইত্যাদি ধার্যকরণ ও আদায় এবং সরকারী অনুদান ছিল জেলা কাউন্সিলের আয়ের উৎস।

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ যেই মূল অথচ ভুল ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা ছিল এই যে, জনগণ অজ্ঞ ও পূর্ণ গণতন্ত্রের অযোগ্য। সুতরাং মাত্র ১৫জন ভোটার (যাঁরা ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যান) জেলা কাউন্সিলের একজন তথাকথিত নির্বাচিত সদস্যকে নির্বাচন করতেন। এ আদেশ বলে জেলা পরিষদকে গণতান্ত্রিকতার দিকে এগিয়ে নেয়া হয় বলে যে দাবী করা হয়েছিল, তা তেমন সঠিকভাবে প্রতিফলিত হতে পারেনি। কারণ জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক মনোনীত হওয়ায় স্থানীয় সরকার হিসেবে জেলা কাউন্সিলের স্বশাসন প্রতিষ্ঠায় যেমন বাধা ছিল তেমনিভাবে তা প্রতিষ্ঠানটির গণতান্ত্রিকতা আনতে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছিল। সংগত কারণেই এ প্রতিষ্ঠানটিতে দূর্নীতি, স্বজন প্রীতি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব দেখা দেয়। সরকারী অনুদানের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ফলে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অভাবও এই প্রতিষ্ঠানটিকে গণতান্ত্রিকতার দিকে ধাবিত হতে বাধা দিয়েছে প্রতি পদক্ষেপে।

বাংলাদেশ আমল ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেশে কোন পার্লামেন্ট বা সংসদ না থাকায় এবং সংবিধান প্রণীত না হওয়ায় রাষ্ট্রপতির আদেশ জারীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কার্যকারিতা আনয়ন করা হয়। ১৯৭২ সালের ২০শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ স্থানীয় পরিষদ ও পৌর কমিটি (বাতিল ও শাসন) আদেশ-১৯৭২ অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-৭ (পি ও-৭) জারীর মাধ্যমে পূর্বের প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে সৃষ্ট সব কটি সংস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার

সব কটি স্তরে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম বদল করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত রাখা হয়। থানা কাউন্সিলের নাম বদল করে থানা উন্নয়ন কমিটি এবং জেলা কাউন্সিলের নাম বদল করে জেলা বোর্ড রাখা হয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২২, ১৯৭৩ ঃ

এ আদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ নামকরণ করা হয়।প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্তির মাধ্যমে তিনজন করে মোট ৯জন সদস্য নির্বাচনের বিধান করা হয়। সমগ্র ইউনিয়নের জন্য একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। জেলা বোর্ডের ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন এই আইনে আনয়ন করা হয়নি।

স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ-১৯৭৬ ঃ

১৯৭৬ সালের ২২শে নভেম্বর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারী করা হয়। এ অধ্যাদেশ দ্বারা ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ এই তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠন করা হয়।

এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারী ও মনোনীত মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হতো। তবে মহিলা মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা নির্বাচিত সদস্যদের চেয়ে কোন অংশেই কম হতো না। নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের মোট সংখ্যার কমপক্ষে এক-দশমাংশ মহিলা সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ অধ্যাদেশ জারী হওয়ার পরে জেলা পরিষদের কোন নির্বাচন দীর্ঘদিন অনুষ্ঠিত হয়নি। এই আইনে জেলা পরিষদের দায়িত্ব ছিল পাঠাগার, হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী, সরকারী সড়ক, কালভার্ট, পুল, সরকারী বাগান, খেলার মাঠ, ডাকবাংলা ইত্যাদি নির্মাণ, সংরক্ষণ/সংস্কার করা। তাছাড়া স্বেচ্ছায় কল্যাণমূলক কাজ, সাংস্কৃতিক, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত ও অন্যান্য কার্যাবলী জেলা পরিষদের দ্বারা সম্পাদনের বিধান রাখা হয়।

স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ আইন-১৯৮৮ ঃ

১৯৮৮ সালের ৪ঠা জুন তারিখে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন পাশ হবার পরে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী একটি করে জেলা পরিষদ স্থাপিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলার নামে জেলা পরিষদটি পরিচালিত হবে মর্মে উল্লিখিত হয়। এই আইন পাশের আগে পূর্ববর্তী আইন অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ এর ৯৭(২) (।।) ধারার বিধান অনুযায়ী পূর্বতন জেলাগুলিতে (পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া) জেলা প্রশাসকগণই জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করে যেতেন। এই আইনটি পাশ হবার পরে জেলা পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মর্যাদা পায়।জেলা পরিষদের স্থানীয় ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে। আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে স্থাবর ও অস্থাবর উভয়

প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে ও পরিষদের নামে মামলা দায়ের করতে পারবে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে। প্রতিনিধি সদস্য, মনোনীত সদস্য, মহিলা সদস্য ও কর্মকর্তা সদস্য সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। জেলার সংসদ সদস্যগণ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা-সমূহের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য হবে বলে উক্ত আইনে বিধান রাখা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, জেলা পরিষদের কর্মকর্তা (অর্থাৎ অফিসিয়াল) সদস্যদের ভোট প্রদানের ক্ষমতা ছিলনা।

এই আইনের প্রথম তফসীলের বিধান মোতাবেক জেলা পরিষদের দুই ধরনের কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যবস্থা রাখা হয়। এগলি হলো (১) আবশ্যিক (২) ঐচ্ছিক। আবশ্যিক কার্যাবলী ছিল মোট বারোটি যা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। এগুলি হলোঃ জেলার মধ্যে সকল উন্নয়ন উদ্যোগের পুনরীক্ষণ, উপজেলাকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষা, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভাসমূহ বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয় এরূপ জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ, সরাইখানা নির্মাণ, ডাকবাংলা, বিশ্রামাগার, উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলী সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। আর ঐচ্ছিক কার্যাবলীর মধ্যে আছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, অর্থনৈতিক ও জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় এলাকা ও এলাকাবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো এই যে, জেলা পরিষদ তার তহবিলের সংগতির উপরে ভিত্তি করে সরকারী নির্দেশ বা সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী আবশ্যিক কার্যাবলী সম্পাদন করবে। আর ইচ্ছা করলে বা সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী জেলা পরিষদ ঐচ্ছিক কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবে। তাছাড়া সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে জেলা পরিষদ যে কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বা প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারে। তবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান, তহবিলের উপরে দায় মুক্ত ব্যয়, দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হবে।

দ্বিতীয় তফসিলের বর্ণনানুযায়ী জেলা পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে ৮(আট)টি উৎস হতে নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে ঃ (১) স্থাবর সম্পত্তির উপরে ধার্য অংশ (২) বিজ্ঞাপনের উপরে কর (৩) জেলা পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও কালভার্ট অথবা ফেরীর উপরে টোল (৪) জেলা পরিষদ স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস (৫) জেলা পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলককাজ সম্পাদনের জন্য রেট (৬) জেলা পরিষদ কর্তৃক কৃত জনকল্যাণমূলক কাজ হতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস (৭) জেলা পরিষদ কর্তৃক কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস এবং (৮) সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর।

এই আইন বলে জেলা পরিষদের জন্য সরকার কর্তৃক একজন চেয়ারম্যান তিন বছরের জন্য মনোনয়নের মাধ্যমে নিয়োজিত করার বিধান রাখা হয়। এই আইনের আওতায় প্রথমবারের মতো সরকারী দলের সংসদ সদস্যদেরকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তবে ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি আর কোন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হয়নি বা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়নি।

এই আইনের অধীনে যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করার ক্ষমতা জেলা পরিষদের থাকবে। জেলা পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপরে ন্যস্ত হবে এবং এই আইন ও বিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যকোন ব্যক্তির মাধ্যমে যুক্ত হবে। জেলা পরিষদের নির্বাহী বা অন্যকোন কার্য জেলা পরিষদের নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণীকৃত হতে হবে। জেলা পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করবেন। জেলা পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী একটি বইতে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং এর একটি করে অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হবার তারিখের ১৪ দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার এবং সরকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

জেলা পরিষদ তার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি নিয়োগ করতে পারবে এবং উক্তরূপে কমিটির সদস্য সংখ্যা ও এর দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করতে পারবে।

প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে জেলা পরিষদ উক্ত বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর বাজেট বলে উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করবে এবং তার একটি অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার ও সরকারে নিকট প্রেরণ করবে। কোন অর্থ বছরের শুরু হওয়ার আগে কোন জেলা পরিষদ তার বাজেট অনুমোদন করতে না পারলে, সরকার উক্ত বছরের জন্য একটি আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে তা প্রত্যয়ন করবে এবং এরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী জেলা পরিষদের বাজেট বলে গণ্য হবে। অবশ্য বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে সরকারী আদেশ দ্বারা অনুরূপ সংশোধিত বাজেটই জেলা পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলে গণ্য হবে। কোন অর্থ বছর শেষ হওয়ার আগে যে কোন সময় সেই অর্থ বছরের জন্য, প্রয়োজন হলে, একটি সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী যতদুর সম্ভব প্রযোজ্য হবে। প্রতিটি জেলা পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি অর্থ বছর শেষ হওয়ার পরে জেলা পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করবে এবং পরবর্তী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে তা সরকারের নিকট প্রেরণ করবে। উক্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য জেলা পরিষদ কার্যালয়ে প্রকাশ্যে লটকিয়ে রাখতে হবে। উক্ত হিসাব সম্পর্কিত জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ জেলা পরিষদ বিবেচনা করবে। প্রতিটি জেলা পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিরীক্ষিত হবে।

১৯৯০ সালের পরে জেলা পরিষদের গঠন ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। জাতীয় সংসদের সদস্যের স্থলে জেলা প্রশাসক পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ এই দুই স্তরে স্থানীয় সরকার পদ্ধতি গঠনের সুপারিশের ভিত্তিতে এই দুই স্তরের স্থানীয় সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যকর হলেও জেলা পরিষদ অকার্যকর থাকে এবং বর্তমানে এর অস্তিত্ব কোন রকমে টিকে আছে বলা যেতে পারে। বর্তমানে জেলা পরিষদের সার্বিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য একজন জ্যেষ্ঠ সিনিয়র সহকারী সচিবকে জেলা পরিষদের সচিব নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিজস্ব আয়ের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর খাতে আয় সম্প্রতি শতকরা ২(দুই) ভাগ থেকে ১(এক) ভাগে হ্রাস করে বাকী ১ (এক) ভাগ ইউনিয়ন পরিষদকে দেয়া হয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের প্রদত্ত শর্তানুযায়ী।

বর্তমানে যে সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে পুরাতন ও ঐতিহ্যময় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদের পুনরুজ্জীবন অত্যাবশ্যকীয়। গণতন্ত্রায়ন, প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ এবং সুশাসনের জন্য জেলা পরিষদকে পুনর্গঠিত করে তার যথাযোগ্য মর্যাদা এবং যথোপযুক্ত ক্ষমতা দেয়া হলে সরকারের অনেক দায়িত্ব ও কার্যক্রম আরও সুচারূপে সম্পন্ন করার পথ পাবে। নবতর বিন্যাসে জেলা পরিষদকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণের অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৮৫ সালে সৃষ্ট জেলা পরিষদ ক্রমান্বয়ে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে থাকে এবং বৃটিশ আমলের শেষ দিকে এসে এই প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হয়। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবেই পরিচালিত হচ্ছিল। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে জেলা কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে জেলা পরিষদকে গণতান্ত্রিক চরিত্র প্রদান করা হয়েছিল বলে মৌলিক গণতন্ত্রের ব্যাপক প্রচার চালালেও প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থায় জেলা পরিষদের গণতান্ত্রিক চরিত্র বিকশিত হয়নি। বরং উল্টোভাবে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে সরকারী কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়ার মাধ্যমে এবং ৫০% সদস্যকে জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়নের বিধান রাখায় জেলা পরিষদ আসলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হওয়ার কাঠামোগত বাধাই শুধুই পায়নি বরং তা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি। তাছাড়া এই বিধান অনুযায়ী আর্থিক বিষয়ে জনপ্রতিনিধিগণের কোন সিদ্ধান্ত নেয়া বা অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে তেমন কোন ক্ষমতা ছিলনা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭২ সালে পি ও জারীর মাধ্যমে জেলা কাউন্সিল এর নাম পরিবর্তন করে জেলা বোর্ড রাখা হয়। এর পরে ১৯৭৬ সালের ২২শে নভেম্বর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারী করে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। আর

জেলা পরিষদের সদস্যদের প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের ভোটে সরাসরিভাবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। কিন্তু এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি দীর্ঘদিন ধরে। প্রকৃতপক্ষে জেলা প্রশাসক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৮৮ সালে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন পাশ হবার পরে জেলা পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় পরিণত হয় তাত্ত্বিকভাবে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে সংসদ সদস্যকে মনোনয়ন দানের বিধান মোতাবেক একবার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু তাও আবার পরবর্তী এক সংশোধনী মোতাবেক স্থগিত করা হয়। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে জেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, যিনি কিনা বর্তমানে জেলা পরিষদের সার্বিক কর্মকান্ডই পরিচালনা করে আসছেন। অর্থাৎ জেলা পরিষদ তাত্ত্বিকভাবে একটি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিভাত হলেও বাস্তবে তা সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হয়েছে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানটি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা সামান্য সময় ছাড়া কখনোই পরিচালিত হওয়ার সুযোগ পায়নি।

অথচ জেলা পরিষদ-এর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে অত্যন্ত শক্তিশালী ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠানরূপে বিকশিত হওয়া দরকার ছিল।

জেলা পরিষদের সম্ভাব্য ভবিষ্যত রূপরেখা ঃ

যে কোন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত রূপরেখা কেমন হবে বা কেমন হওয়া উচিৎ তা অনুমান করাটা সহজতর হলেও বাস্তবে এর রূপায়ন সর্বক্ষেত্রে আশানুরূপ হয়না। কারণ প্রায়ই তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। আবার যে কোন তত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বের থেকে বেশ কিছুটা পার্থক্যশীল হয়ে ওঠে। তাছাড়া পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাবে প্রায়ই কোন তত্ত্ব বাস্তবায়নের সময় তাত্ত্বিক প্রতিকল্প থেকে পার্থক্যশীল হয়ে পড়ে। তাই এসব বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে জেলা পরিষদের ভবিষ্যত রূপরেখা কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে আলোকপাত করলে ভাল হবে। এদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রূপরেখা কেমন হওয়া উচিৎ এ ব্যাপারে সম্প্রতি গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশন যথেস্ট চিন্তাভাবনা করে বিস্তারিত প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করে আইনে পরিণত করেছে। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম পরিষদ সম্বন্ধে বিলের খসড়া সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু জেলা পরিষদ-এর ভবিষ্যত রূপরেখা সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব এখনও বিলের খসড়া আকারে সংসদে উপস্থাপিত না হওয়ায় এর ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্বন্ধে অনুমান করা বেশ অসুবিধাজনক। তবুও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদের ভবিষৎ রূপরেখা সম্বন্ধে নিম্নে আলোকপাত করা হলো ঃ

জেলা পরিষদের গঠন ঃ

১। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলার প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে সরাসরিভাবে নির্বাচিত হবেন।

২। যদি আর্থিক সংশ্লেষ বা অন্যান্য জটিলতার কারণে সম্ভব না হয়, তবে ইলেক্টরাল কলেজের মাধ্যমে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩। জেলার প্রতি থানা থেকে দুইজন সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

৪। মোট সদস্যের অতিরিক্ত এক-তৃতীয়াংশ মহিলা (সংরক্ষিত আসনে) সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

৫। সংশ্লিষ্ট জেলার আওতাভুক্ত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণ এবং পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে জেলা পরিষদের সদস্য হবেন।

৬। জেলা পর্যায়ের সকল সরকারী কর্মকর্তা পদাধিকারবলে জেলা পরিষদের সদস্য হবেন। তবে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে এই পরিষদের সদস্য না করলে ভাল হবে।

৭। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ-মর্যাদা প্রতিমন্ত্রী সমতুল্য হলে ভাল হয়।

৮। জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন।

৯। বিচারের কোর্ট ও বিচারকবৃন্দ ব্যতীত জেলা পর্যায়ে পুলিশসহ সকল সরকারী দপ্তর জেলা পরিষদের নিকট অর্পিত হবে। এসব দপ্তরের সরকারী কর্মকর্তাদের জেলা পরিষদে প্রেষণে দেয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তারা জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। তাদের ACR দপ্তরের উচ্চতর কর্মকর্তাগণ লিখবেন। আর তাদের কাজের উপরে Performance Report জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান দ্বারা লিখিত হবে।

জেলা পরিষদ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে ঃ

১। এ যাবৎ কালে প্রণীত আইন/বিধি মোতাবেক জেলা পরিষদ যে সব কাজ করে যাচ্ছে জেলা পরিষদ সে সব কাজ করবে।

২। থানা পরিষদসমূহের কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ (মনিটরিং) করা।

৩। জেলার সবকটি থানার উন্নয়নের সম্ভাবনা, প্রয়োজনের ভিত্তিতে একটি জেলা পরিকল্পনা তৈরী এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর দ্বারা নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের অধীনস্থ অফিসের মাধ্যমে স্ব-স্ব উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় সাধন করা।

৪। জেলা পর্যায়ে অবস্থিত কলেজ ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকী ও মনিটরিং করা।

৫। জেলার অন্তর্গত সংযোগ-সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণের প্রস্তাব তৈরী করে জেলা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করা।

৬। জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সরকারী হাসপাতাল, পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ইত্যাদির কার্যক্রম তদারকী ও মনিটরিং করা।

৭। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

৮। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার লাভে সহায়তা প্রদানে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সরাসরি বিনিয়োগসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

৯। জেলার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধনে সহায়তা প্রদান, সন্ত্রাস প্রতিরোধ সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং পুলিশের কাজের তদারকী করা।

স্থায়ী কমিটি সমূহের গঠন ঃ

জেলা পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কমিটিগুলি গঠন করা হবে। জেলা পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কমিটিগুলি গঠন করা হবে। জেলা পরিষদের একজন সদস্য বা সদস্যা এসব স্থায়ী কমিটির সভাপতি হবেন।

১। আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটি

২। গণপূর্ত, সড়ক ও জনপথ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ফ্যাসিলিটিজ সংক্রান্ত কমিটি।

৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পানীয়জল ও স্যানিটেশন কমিটি।

৪। সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক, যুব উন্নয়ন এবং ক্রীড়া বিষয়ক কমিটি।

৫। কৃষি, সেচ, সমবায়, মৎস ও পশুপালন বিষয়ক কমিটি।

৬। শিক্ষা বিষয়ক কমিটি।

৭। ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এনজিও কার্যক্রম ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী সংক্রান্ত কমিটি।

এসব কমিটি ছাড়াও প্রয়োজনবোধে আরও কমিটি গঠিত হতে পারে। উপর্যুক্ত কমিটিগুলি পুনর্বিন্যস্ত হতে পারে প্রয়োজন অনুযায়ী।

আর্থিক ক্ষমতা বা আয়ের উৎস ঃ

১৯৮৮ সালে প্রণীত জেলা পরিষদ আইনে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতাসমূহ বহাল রাখা যেতে পারে। ঐ আইনে নির্ধারিত খাতে কর, সেস, টোল আদায়ের ক্ষমতাসমূহ বহাল রাখা যেতে পারে। আর আয়ের উৎসসমূহ থেকে যাতে জেলা পরিষদ আয় করতে পারে সেজন্য যথাযথভাবে উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও আইনগত সমর্থন রাখা যেতে পারে। তাছাড়া বর্তমানে জেলা পরিষদকে প্রদত্ত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর খাতের আয়ের ১% প্রদানের বিষয়টি বহাল রেখে ভূমি রাজস্ব আয়ের ৫% জেলা পরিষদকে প্রদান করা যেতে পারে। জেলা পরিষদের নিজস্ব হাট-বাজার, ফেরীঘাট এবং জলমহাল ব্যতীত সাত লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হাট-বাজার, তিন লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ফেরী

ঘাট, আন্তঃ থানা ফেরীঘাট (যে কোন মূল্যমানের) এবং তিনলক্ষ টাকার উর্ধ্বে জল মহালের ইজারা এবং ইজারালব্ধ আয় জেলা পরিষদের অনুকূলে দেয়া যেতে পারে। তবে আয় ব্যয়ের পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন হতে পারে। প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট নির্দেশিকা অনুযায়ী বাজেট প্রণীত হবে। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট ছকের থেকে বিচ্যুতি হলে কর্তৃপক্ষ সে সব সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করবে। আবার জেলা পরিষদ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশিকা অনুসরণ করবে। জেলা পরিষদ স্ব-স্ব আয়-ব্যয়ের হিসেব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে। বছর শেষে আয়-ব্যয়ের হিসেব আভ্যন্তরীণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারে অডিট কর্তৃপক্ষ দ্বারা অডিট করা হবে। আর জেলা পরিষদ অডিট নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিবে এবং অডিট প্রতিবেদন বা সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

উপসংহার

উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জেলা পরিষদ প্রাচীনতম। প্রাচীনতম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদের কার্যকারিতা নিয়ে যতই বিতর্ক করা হোক না কেন নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে জেলা পরিষদের গুরুত্বকে স্বীকার করতেই হবে। সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিটে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ প্রক্রিয়া জেলা পরিষদের অবস্থান বা গুরুত্বকে সর্বাগ্রে উপলব্ধি করতে হবে। জেলা আজকে প্রশাসনিক ইউনিটের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয়। আর প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধনের জন্য সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হলে জেলা পরিষদকে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলা প্রয়োজন। বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদের আরও কার্যকর এবং জোরালো ভূমিকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় এবং শক্তিশালী করা সম্ভব বলে অনেকে মনে করেন। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিশালীকরণের প্রচেষ্টা এদেশে যুগ যুগ ধরে চালানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিশালীকরণের যে দাবী বা প্রচারণা এ যাবৎ কাল চলেছে তা অনেকটাই ছিল অতিরঞ্জিত।

অন্য কথায় বলা যায় যে, অনেক রাজনৈতিক নেতৃত্বই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালালেও বাস্তবে তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী বা সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত এবং স্বকীয় ধারায় বিকাশযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সক্ষম হননি। ফলে এদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ সম্বন্ধে যতই হৈ চৈ বা প্রচারণা চালানো হোক না কেন, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করতে পারেনি বা সমাজে গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। এমতাবস্থায় আশা করা যায় যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কেন্দ্র বিন্দু

হিসেবে বিবেচিত জেলা পরিষদসমূহকে যদি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত করা যায় তবে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের পথ সুগম হবে। আর এরই সূত্র বেয়ে সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও অগ্রগতি সাধিত হবে উত্তরোত্তর প্রক্রিয়ায়।

গ্রন্থপঞ্জি

০১। বাংলাদেশ সরকার, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান*, গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা।

০২। *রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৭, ১৯৭২।*

০৩। *রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ২২, ১৯৭৩।*

০৪। *স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ*, ১৯৭৬। বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়: ঢাকা, ১৯৭৬।

০৫। *স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন*, ১৯৮৮, বাংলাদেশ সরকার মুদ্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৮।

০৬। পূর্ব পাকিস্তান সরকার, আইন মন্ত্রণালয়, *মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ*, ১৯৫৯, ইপিজি প্রেস, ঢাকা, ১৯৬৬।

০৭। Government of Bengal (Legislative Department). *The Village Chowkidari Act. 1870*. BG Press. Alipore. 1890.

০৮। Government of East Bengal (Legislative Department). *The Bengal Self Government Act.* 1919. BT Press. Alipore. 1991.

০৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। *প্রতিবেদন, স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন।* স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন, ঢাকা, ১৯৯২।

১০। Siddiqui Kamal. *Local Government in Bangladesh*. University Press Limited. Dhaka. 1994.

১১। Ahmed. Ali. *Administration of Local Government for Rural Areas in Bangladesh*. LGI Dhaka.

১২। Alam. Bilquis Ara. *The Ordinances of Rural Local Bodies* (with up to date amendments). National Institute of Local Government. Dhaka 1986.

১৩। Rahman. A. T. and Rahman. S. *Local Government in Bangladesh : An Agenda for Governance. Division of Public Administration and Development.* Department of Development and Management Servies. UNDP. New York. 1996.

১৪। Ahmed. Syed Gias Uddin. *Local Government : A Typology of Development Administration*. Dhaka University Studies XXIII (Part A).

১৫। হক, আবুল ফজল, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

১৬। Ali AMM. Showkat. *Field Administration & Rural Development in Bangladesh*. Dhaka. CSS-1982

১৭। Ali Shaik Maqsood et al. *Decentralization and People's Participation in Bangladesh*. Dhaka. NIPA. 1983.

১৮। Alam Manjur-ul. *Leadership Pattern. Problemes and Prospects of Local Government in Rural Bangladesh*. Comilla. BARD. 1976.